নয়া দিগন্ত

তারিখঃ ২৯/১০/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০৬)

উপকূলীয় অঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় জাতের ধান

● **রফিকুল ইসলাম** *রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী)*

সাদা মোটা, কালাকোরা নামের ধানের নাম এখন অনেকেরই হয়তো মনেই নেই। কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই দেশী প্রজাতির ধানের প্রজাতিগুলো। এই ধান সংরক্ষণেও কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটিতে ফলানো এসব দেশী ধান। তার বদলে জায়গা করে নিচ্ছে হাইব্রিড। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে চোখে পড়ার মতো কোনো প্রতিবাদও হচ্ছে না কোথাও।

রাঙ্গাবালীতে ক্ষেতে দেশীয় প্রজাতির ধানগাছ ■ নয়া দিগন্ত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সূত্রে জানা যায়, ১৯১১ সালে ১৮ হাজার জাতের ধানের একটি রেকর্ড আছে। ১৯৮৪ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে করা একটি জরিপে ১২ হাজার ৪৮৭ জাতের হিসাব পাওয়া যায়। সর্বশেষ ২০১১ সালের জরিপ বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে আট হাজার জাতের ধান আছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এসব ধান বিলুপ্তির পথে। এক সময় যে ধানগুলো চাষ করা হতো, তার মধ্যে ছিল কালিজিরা, কালাকোরা, কাজলসাইল, সর্ণমুসুরি, সর্ণগোড়া, সাদামোডা, ডিঙ্গামনি, সাক্কোনকোরা, বিন্নি, শালি, লালচল্লিশ, জামাইভোগ ও রাজা। এসব ধানের নাম শুনলে এখন বোঝাই যায় না যে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একসময় এসব জাতের ধানের চাষ হতো।

এ ধরনের অনেক চমকপ্রদ নামের দেশীয় জাতের ধানের অস্তিত্ব এখন আর নেই। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রায় ১৫ হাজার জাতের দেশীয় ধানের তথ্য পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ দেশে একসময় বিভিন্ন মৌসুমে প্রায় এক থেকে দের হাজার জাতের ধান চাষ হতো। ধীরে ধীরে সেসব দেশী ধানের জাত এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কৃষকরা বলেন, আগের মতো নানা জাতের ধান এখন আর চাষ করা হয় না। সংখ্যার বিচারে কয়েক হাজার জাতের ধান চাষের কথা বলা হলেও মূলত সামান্য কয়েকটি জাতের ধান এখন ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়।

দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে খাদ্য চাহিদাও। মানুষ বাড়ার সাথে সাথে চাষযোগ্য জমিও দিন দিন কমে যাচ্ছে। অল্প জমিতে ধানের উৎপাদন না বাড়ালে মানুষের খাবার আসবে কোথা থেকে? দেশীয় জাতের ধানের উৎপাদন কম হয়, এ কারণে বাজারে আসছে নিত্যনতুন হাইব্রিড ধান। এসব ধান উৎপাদন করে বিজ্ঞানীরা দেশের খাদ্যঘাটতি কমাতে ব্যস্ত। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানীরা আবহাওয়া, প্রাকৃতিকদুর্যোগ মোকাবেলা করে অল্প সময়ে বেশি ফলন দেয় এমন জাতের ধান উদ্ভাবনে সচেষ্ট। সরকারের কৃষিতথ্য সার্ভিস জানায়, বাংলাদেশে এখন হাইব্রিড এবং উফশীসহ আরো অনেক ধরনের আধুনিক জাতের ধান চাষ হচ্ছে। এসব ধান উদ্ভাবনে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় সেগুলো হলো কম সময়ে ফলন বেশি হতে হবে, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, উষ্ণতা, তাপ সহ্য করা ছাড়াও রোগবালাই এবং পোকামাকড় মোকাবেলা করে ভালো ফলন দেবে, কোয়ালিটিও ভালো হতে হবে। কৃষি বিভাগের মতে, আউশ, আমন ও বোরোর কয়েকটি জাত বিশেষ কিছু কারণে কৃষকদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। যেমন : খরাসহিষ্ণু রোপা আমন (ব্রি৭১), যার চাল হয় লম্বা ও মোটা এবং সাদা রঙের; উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন (ব্রি৭৫), যার চাল হয় মাঝারি, মোটা ও সাদা রঙের এবং অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটাসহিষ্ণু রোপা আমন (ব্রি৭৬), যার জনপ্রিয়তা বেশি। আবার বোরো মৌসুমে একসময় কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল উচ্চ ফলনশীল বোরো (ব্রি২৮ ও ব্রি২৯), যার চাল মাঝারি, চিকন ও সাদা। কিন্তু এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে (ব্রি৯৬) হিসেবে পরিচিত উচ্চ ফলনশীল বোরো, যার চাল মাঝারি ধরনের, খাটো ও সোনালি রঙের। নতুন এই জাতটির ফলন হয় একই সময়ে দেড় থেকে দুই টন বেশি।

এ দেশের ভৌগোলিক পরিবেশভেদে এত বৈচিত্র্যময় ধান হতো যে সেসব জাতের ধানের হদিস পাওয়াও এখন কঠিন। দেশীয় ধানের বড় সুবিধা হলো কীটনাশক, সার ও বিষ কিছুই লাগে না। পরিবেশ ও মানুষবান্ধব ধানের জাত এগুলো। অথচ সেসব ধানকে বিদায় দিয়ে আমরা উচ্চ ফলনশীল ধান ফলাতে মরিয়া। অথচ উফসী ধানে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও কৃষকরা উচ্চ ফলনের আশায় আটকে গেছেন মাত্র আট থেকে দশটি ধানের মধ্যে। এ কারণে আমাদের উপত্যকায় প্রাণিকুলের জীবন এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ হুমকির মুখে।

ধান বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশী ধান রক্ষার আমাদের সবার জোরালো ভূমিকা রাখা উচিৎ। নতুবা হাইব্রিড কালচারে আমরা কত কী হারাব তা গুনে বলা যাবে না। সরকারের উচিত দেশী ধানের পেটেন্ট তৈরি করে সংরক্ষণ করা। অন্যথায় আমরা এসব বীজ হারিয়ে ফেলব। একটি দেশী ধানের জাত হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি এলাকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, এটাও আমাদের ভাবতে হবে।